রক্তাক্ত গুজরাত,২০০২

অরুন্ধতী রায়

বহুরূপী

গুজরাতে হাঙ্গামা বাধতেই বাঙ্গালোরে আর এস এসের অধিবেশনে মুসলিমদের উদ্দেশে ফরমান জারি হল ঃ 'সংখ্যাগরিষ্ঠদের আস্থা অর্জন কন।' বি জে পি-র নীতি ও সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর এই আর এস এস সদস্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীও। গোয়ায় বি জে পি-র কর্মসমিতির বৈঠকে প্রকৃতপক্ষে নায়কের সম্মান পেয়েছেন শেষোক্ত ব্যক্তিটি । প্রচুর নাটক করে মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন নিজেই। গোটা দল পরিকল্পিতভাবেই তুমুল হইচই করে সে প্রস্তাব নাকচ করল। তা বেশ! সম্প্রতি এক ভাষণে এই নরেন্দ্র মোদি গুজরাত কাণ্ডের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডিযাত্রার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে দুটি ঘটনাই সংগ্রামের গুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

ভারতের সমকালীন ইতিহাস ও যুদ্ধপূর্ব জার্মানির ইতিহাস, সাযুজ্য রোমহর্ষক। তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতারা প্রকাশ্যেই হিটলার ও হিটলারি পদ্ধতির প্রতি তাঁদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।তফাত এটুকুই যে,ভারতের কোনও হিটলার নেই। তার বদলে আছে গ্রিক পুরাণকথিত হাইড্রার মতো বহুশির 'সংঘ' দানব। সংঘ পরিবারের অনেক মুখ- বি জে পি, আর এস এস, বিশ্ব হিন্দুপরিষদ, বজরং দল। এই সব নানা মুখের সুর গান মিলে তৈরি হয়েছে এক অনবদ্য ঐকতান। সব মিলিয়ে গোটা সংঘ পরিবারের প্রতিভার চেহারাটা বেশ স্পষ্ট। আর যাই থাক, সব ধরনের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একাধিক মুখোশের অভাব একেবারেই নেই।

অভাব নেই অবস্থা বুঝে সামনে এগিয়ে দেওয়ার মতো লোকেরও । আছে বক্তৃতাপটু বৃদ্ধ পদ্যকার। জনতা খেপাতে সক্ষম কট্টরপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আপাতভদ্র বিদেশমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমে বিতর্ক সামাল দিতে মসৃণ ইংরেজিভাষী আইনজীবী। আছেন ঠান্ডা রক্তের সরীসৃপ মুখ্যমন্ত্রীও। তদুপরি বজরং দল ও হিন্দুপরিষদের তৃণমূল স্তরের সেই সব কর্মী - যারা গণহত্যার শারীরিক পরিশ্রমে উদ্দীপ্ত হয়। আর ও একটি আশ্চর্য অঙ্গ আছে সংঘ পরিবারেরয । টিকটিকির লেজের মতই, যা সময় বুঝে খসে পড়ে, যথাকালে আবার গজিয়েও ওঠে । সমাজবাদী জামা - পরা এই প্রতিরক্ষামন্ত্রীটিকে ব্যবহার করা হয় যুদ্ধ, ঘূর্ণিঝড় বা গণহত্যাজনিত ক্ষতির সামাল দিতে। পরিবারের আশা, উনি ঠিক মুহূর্তে ঠিক বোতাম টিপে সঙ্কটমোচনে সহায়তা করবেন।

একাধিক মাথার মতো একাধিক কণ্ঠ সংঘপরিবারের । ফলে, একই সময় পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করতে তাদের একটুও আটকায় না। যেমন, হিন্দুপরিষদ যখন তাদের গেয়া বাহিনীকে 'চরম সমাধানের' প্রস্তুতি নিতে বলে, প্রধানমন্ত্রী সেই মুহূর্তে দেশবাসীকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি শোনান। এরই পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি অবমাননার দায়ে সংঘের রোষে পোড়ে ছবি। নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে শ্বাস ওঠে বই বা চলচ্চিত্রের। একই সঙ্গে গোটা দেশের গ্রামোন্নয়ন খাতে ব্যবহার্য তহবিলের ৬০ শতাংশ অর্থ বহুজাতিক এনরন সংস্থার কাছে বন্ধক রাখতে পারে এরাই দ্বিধাহীনভাবেই । এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভিন্নতাও অক্লেশে ধ্বনিত হয় পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের কণ্ঠে। যা হতে পারত দুই রাজনৈতিক দলের দ্বৈরথ, তা পর্যবসিত হয় নেহাত পারিবারিক কলহে। সে ঝগড়া যতই তিক্ত হোক, তার পুরোটাই হয় সাধারণ্যে, লোকচক্ষুর সামনে। স্বাভাবিক কারণেই এই নাটুকে ভুল বোঝাবুঝির ইতি হয় পারস্পরিক আলিঙ্গনে। দর্শকের মনতুষ্টির খোরাক জোগানো ছাড়া এই সব ঝগড়াঝাঁটির অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। পয়সা উসুল যাতে হয়, সেদিকে সংঘের সদাসতর্ক নজর । ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র, বেদনা, কবিতা, নৃশংসতা- যাবতীয় উপাদানে ঠাসা জমজমাট নাটক । আর এরই অন্তরালে, অপেক্ষাকৃত শান্ত মুহূর্তে স্পষ্ট শোনা যায় একটি মাত্র দানবের হৃদস্পন্দনের শব্দ।

ভারতের ইতিপূর্বে গণহত্যা ঘটেছে । সব ধরনের গণহত্যা। মারা হয়েছে নির্দিষ্ট জাতি-বর্ণ-ধর্মের মানুষকে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুজনিত দাঙ্গায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্রেফ দিল্লিতেই প্রাণ হারান তিন সহস্র শিখ। সেই দাঙ্গার চেহারা গুজরাত কাণ্ডের তুলনায় কমভয়ঙ্কর নয়। বাক্‌পটু হিসেবে তেমন খ্যাতি না থাকলেও, সেই মুহূর্তে রাজীব গান্ধীর মন্তব্য ঃ 'মহীহ পতনে ভুমিকম্প স্বাভাবিক ।' পরের ভোটেই কংগ্রেসের বিরাট জয় । সহানুভূতির ঝড় । ১৮ বছর পরেও ৮৪-র দাঙ্গার দোষীদের শাস্তি হয়নি ।

পরমাণু পরীক্ষা, বাবরি মসজিদ, তহলকা কেলেঙ্কারি, ভোটের জন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি- সব ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাতেই বি জে পি-র পূর্বসূরি হিসেবে কাজ করেছে কংগ্রেস । কংগ্রেস বীজ বপন করে গেছে , বি জে পি ফসল তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । এক্ষত্রে ভোট দিতে গিয়ে আমরা কি কংগ্রেস ও বি জে পি-র মধ্যে পার্থক্য দেখব ? উত্তরে দ্বিধা আসবে, তবু বলব,'হ্যাঁ'। কংগ্রেস কয়েক যুগ ধরে পাপ করেছে । কিন্তু তারা যেটা রাতের অন্ধকারে করত, বি জে পি সেটা দিনের বেলাতেই করে। কংগ্রেস দুষ্কর্ম করত চুপিচুপি , অন্তত লজ্জার আব্রুটুকু থাকত। বি জে পি দুষ্কর্ম করে স্পর্ধার সঙ্গে। এই পার্থক্যটা জরি । সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো সংঘ পরিবারের বাধ্যতামূলক কর্তব্য । বহু বছর ধরে পরিকল্পিত । খুব ধীরে ধীরে সমাজের রক্তস্রোতে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে । দেশজুড়ে শয়ে শয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা আর সরস্বতী শিশু মন্দিরে হাজার হাজার বালক ও কিশোরের মগজধোলাই হচ্ছে । ঠেসে দেওয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

আর ভুল ইতিহাস । এরা তালিবানের জন্মদাতা, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের সেই সব মাদ্রাসা থেকে একচুল আলাদা নয় । গুজরাতের মতো রাজ্যে পুলিস, প্রশাসন আর রাজনৈতিক ক্যাডার- সর্বস্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বিষ। এই তত্ত্বের জনপ্রিয়তা ব্যাপক । একে উপেক্ষা বা এর ভুল ব্যাখ্যা করা মুর্খামিই হবে। ধর্মীয়, আদর্শগত, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে রীতিমত সমীহ জাগানো শক্তি। রাষ্ট্রীয় মদত ছাড়া এতটা শক্তি সংহত করা সম্ভব নয় ।

সাম্প্রদায়িকতা চাষের মুসলিম সংস্করণ মাদ্রাসাও উন্মাদনা ছড়ায়, বিদেশি অর্থও পায়। কিন্তু তাদের পেছনে নেই রাষ্ট্রীয় মদত । হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির চমৎকার পরিপূরক এরা । এত নিখুঁতভাবে একে অন্যের কাজে লাগে, মনে হয় যেন দলবেঁধে কাজ করছে ।

এই অবিরাম নরক যন্ত্রণার চাপের মুখে খুব স্বাভাবিকভাবেই যা হতে পারে, তা হল ঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠঅংশ দেশে বাস করতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মতো ; নোংরায়, অপরিচ্ছন্নতায় আত্মসমর্পণ করে। অবিরত ভয় তাদের সঙ্গী, কোনও সভ্য সমাজের স্বাভাবিক সামাজিক অধিকার তাদের জুটবে না, ন্যায়ের পথও তাদের কাছে থাকবে অজানাই। কেমন কাটে বা কাটতে পারে তাদের দৈনন্দিন জীবন ? খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে, সিনেমার লাইনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া বা ট্রাফিক সিগনালে আটকে পড়া হট্টগোল থেকে হিংস্রতার চর্চা ছড়িয়ে পড়তে পারে হানাহানিতে। ফলে, তারা যেন আত্মবন্দী এক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে ধীরে, নিশ্চিতভাবে। কিন্তু ওই ম্লান, বিধবস্ত, শঙ্কাময় জীবনকে মেনে নিয়ে সমাজের এক প্রান্তে চলে যাওয়া ছাড়া তাদেরই বা ভবিষ্যৎ কী ? তাদের আতঙ্ক ছড়িয়ে যাবে সমাজের অন্য সংখ্যালঘুদের মধ্যেও। কিশোর, তণ,যুবকরা কেবলই হয়ে উঠবে জঙ্গি মানসিকতায় অভ্যস্ত। ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটাবে তারা। সমাজ তাদের নিন্দা করবে। প্রেসিডেন্ট বুশের উচ্চারণ ফিরে আসবে আমাদের কাছে, নির্মম, 'হয় তুমি আমাদের সঙ্গে, না হয় তো সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে।'

এসব শব্দ বা উচ্চারণ যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বরফের মতো শক্ত, ধারালো হয়ে উঠতে থাকে, হৃদয়ে গেঁথে যাওয়ার নিরিখে। যেসব বছরগুলো সামনে আসছে, সেই সব অনাগত দিনে মুখাবয়বের ভয়াল হিংস্রতায় খুনেরা নিজেদের খুন, হত্যা, ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে।

শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে, তিনি আবার অতি সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদির বীরত্বের কাছে ম্লান হয়ে গেছেন। অন্তিম মীমাংসাসূত্রের মতই তিনি গৃহযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন । একদিক থেকে এটা তো সত্যিই উচিত কাজ। তখন আর পাকিস্তানের দরকার হবে না আমাদের দিকে বোমা ছোঁড়ার । আমরা নিজেরাই নিজেদের দিকে বোমা ছুঁড়তে পারব। গোটা দেশটাই হয়ে যাবে কীর অথবা বসনিয়া অথবা প্যালেস্টাইন অথবা রোয়ান্ডা । চলুন, আমরাই আমাদের রক্তপাত আর যন্ত্রণাকে চিরকালীন চেহারা দিই । আমরা অস্ত্র কিনি আর বিস্ফোরক আমদানি করি, নিজেরাই নিজেদের হত্যার আয়োজনে মাতি। ব্রিটিশ আর আমেরিকান অস্ত্র ব্যবসায়ীরা আমাদের রক্ত আর হত্যার বিনিময়মূল্যে আরও ফুলেফেঁপে উঠুক । আমরা কার্লাইল গোষ্ঠীকে ডেকে বলতেই পারি, প্রচুর অস্ত্র কিনব, আমাদের ছাড় দিন আরও বেশি। মনে আছে তো, সেই কার্লাইল গোষ্ঠী, একই সঙ্গে বিন লাদেন আর বুশ পরিবার যার শেয়ারহোল্ডার । আর যদি সব ঠিকঠাক চলে অচিরেই আমরা আফগানিস্তানে পরিণত হব। যেমন প্রচার ওরা পেয়েছে, আমাদেরও তেমনই জুটবে। আমাদের ধান-গমের সমস্ত খেতখামার ভরে উঠবে মাইনে, আমাদের ঘরবাড়ি মিশে যাবে ধুলোয়, সব পরিকাঠামো হয়ে যাবে ধবংসস্তূপ, আমাদের সন্তানেরা হবে বিকলাঙ্গ, মানসিক প্রতিবন্ধী , নিজেদেরই সৃষ্ট ও পরিবেশিত ঘৃণায় আমরা নিজেরাই নিজেদের শেষ করে ফেলতে পারব তাহলে। আমরা হয়ত আমেরিকার কাছে আবেদন করতে পারি, এই সমবেত আত্মঘাতের কাজে, প্লিজ, আমাদের সাহায্য কন। আর না হলে কে আছে, আকাশ থেকে পড়া খাবারের প্যাকেটের দিকে আমাদের ঊর্ধবাহু দৌড়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ?

আত্ম- ধবংসের কতটা কাছে আমরা আছি ? আর হয়ত একটা পদক্ষেপ, তার পরই আমাদের আত্মনাশের পথ পরিছন্ন, অবাধ হয়ে যাবে। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী, গোয়ার বি জে পি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে ইতিহাস রচনা করলেন। তিনি হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি প্রকাশ্যে সৌজন্যের সমস্ত সীমা লংঘন করে মুসলিমদের বিদ্ধে বিবেকহীন,অযৌক্তিকধর্মান্ধতা উস্কে দিলেন, যা এমনকি জর্জ বুশ বা ডোনাল্ড রামসফেল্ডও বলতে অস্বস্তি বোধ করতেন। কী বললেন অটলবিহারী ? তাঁর কথায় 'যেখানেই থাকে, মুসলিমরা কোথাও শান্তিতে বাস করতে চায় না ।'

তাঁকে ধিক্কার । কিন্তু তিনিই যে একা নন, তাঁর প্রতি একক ধিক্কারে তাই কোনও মীমাংসাই নেই। গুজরাটের এই নিধনযজ্ঞের পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর আত্মবিশ্বাসী বি জে পি চাইছে ভোট হোক সে রাজ্যে, এখনই। বরোদা থেকে আমার বন্ধুই জানাল, 'ভদ্রতম মানুষজন, সুভদ্রতম ভাষায়, ভঙ্গিতেই বলছে, মোদিই আমাদের নায়ক !'

নিছক ভালমানুষের মতো আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম, গুজরাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি রাগে, দুঃখে নিজ নিজ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে একটি জায়গায় এসে দাঁড়াবে। এককভাবে দেশচালনার জনাদেশ বি জে পি-র নেই । নেই হিন্দুত্বের প্র কল্প চালিয়ে যাওয়া জনাদেশ। সাতাশ শরিককে নিয়ে এরা সরকার চালাচ্ছে। আমরা বোকার মতো আশা করেছিলাম,এই শরিকরা সমর্থন তুলে নেবে। মূর্খের মতো আমার আশা করেছিলাম , এই দলগুলির সামনে এটাই হবে নৈতিকতার শ্রেষ্ঠপরীক্ষা , ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধতার ন্যূনতম পরীক্ষা। সময় দেখিয়ে দিল, শরিকরা শরিক হয়েই আছে । তাদের চোখে খেলা করে গণিতের আঁকিবুকি -কটা আসন বাড়বে বা কমবে, কোন মন্ত্রক হাতে আসবে বা ফসকে যেতে পারে, শুধু এই সব হিসেবনিকেশ। দেশের একমাত্র অবশিষ্ট মুসলিম নেতা ফাক আবদুল্লার নজর উপরাষ্ট্রপতি পদের দিকে। আর দলিত নেত্রী মায়াবতী ? উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটাই তাঁর বড় কথা। দেখলাম এটাও, এইচ ডি এফ সি-র দীপক পারেখ ছাড়া দেশের কোনও কোম্পানি-কর্তা গুজরাতের কাণ্ডকারখানার নিন্দায় মুখ খুলতে পারলেন না ।

নরেন্দ্র মোদির অপসারণ চেয়েছে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। এটুকুই যথেষ্ট ? কাদের কাছে বোধবুদ্ধি বন্ধক রেখেছি আমরা ? কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দোষীদের দস্তুরমত বিচার ও কঠোরতম শাস্তি চাই । গোধরায় যারা ট্রেন পুড়িয়েছে তাদের শাস্তি চাই । গুজরাত জুড়ে যারা অন্য সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষদের হত্যার কাজে মত্ত সেই সমস্ত মানুষ, পুলিশ ও দায়ী প্রশাসন কর্তাদের শাস্তি চাই । যারা গণউন্মত্ততায় ইন্ধন জুগিয়েছে, তাদের শাস্তি চাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে নরেন্দ্র মোদি, বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দুপরিষদের বিদ্ধে এখনই স্বঃপ্রণোদিত মামলাজু করতেই পারে সুপ্রিম কোর্ট। সকলেই জানেন সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্টই আছে।

যত জঘন্য অপরাধই কন না কেন, ভারতে রাজনীতিকদের সাতখুন মাপ। নির্মম গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েও তাঁরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ান । বেড়াতে পারেন। একজন রাজনীতিকের শাস্তি হবে বা হচ্ছে এ পোড়া দেশে এতটা কেউ আশাই করে না। নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সঙ্গীদের শাস্তি দাবি করলে অন্য নেতারা নিজেরাও যে ফাঁদে পড়তে পারেন। এঁদের ক'জনের অতীত নিষ্কলুষ ? তাই, চাচা আপন পরান বাঁচা । সংসদে তুলকালাম করে, অধিবেশন ভেস্তে দিয়ে এঁরা তদন্ত কমিশন গঠন করেন। ফলাফল, পর্বতের মূষিক প্রসব !আসল ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রত্যেকেই ব্যস্ত । স্বার্থের অচলায়তন যাতে ধসে না পড়ে , সেদিকেই যে নজর সকলের । কী হবে, এর প্রতিকার ? কার হাতে, কবে ?

গুজরাট নিয়ে একটা বিতর্ক কেবলই দানা বাঁধছে । ভোট হবে কি হবে না ? নির্বাচন কমিশনই কি ঠিক করবে সেটা ? না,সুপ্মি কোর্ট ? ভোট এখনই বোক বা না হোক, নরেন্দ্র মোদিকে শাস্তি না দিয়ে রাজনীতিতে থাকার সুযোগ দেওয়াটা হবে গণতন্ত্রের হত্যা । গণতন্ত্রের মূল তত্ত্বের পরাভব নয়, নিষ্ঠুর নির্মম অন্তর্ঘাত। সেটাই আরও গভীরতর সমস্যার আঁতুড়ঘর । গণতন্ত্রের গভীরতা বাড়বে কি বাড়বে না, সে প্রশ্ন এই মুহূর্তে একেবারেই অর্থহীন । গণতন্ত্রের চেহারা যেভাবে দুমড়ে, মুচড়ে অপরিচয়ের প্রান্তবর্তী করে তোলা হচ্ছে, তাতে এই সংশয় খুবই স্বাভাবিক। এবং প্রাসঙ্গিক।

ভোট হলে বি জে পি জেতে ? আশ্চর্য (একটি জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, পাকিস্তানের বিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই হবে বি জে পি-র ভোট জয়ের কৌশল) সন্ত্রাসের বিদ্ধে যুদ্ধ করে এরই মধ্যে জর্জ বুশের জনপ্রিয়তা বেড়েছে ৮০ শতাংশ। প্যালেস্টাইনে অভিযান চালিয়ে কট্টরপন্থী এরিয়েল শ্যারনের জনপ্রিয়তাও উর্ধ্বমুখী। এটাই কি তবে সমাধানের পথ ? যদি হয়, তবে বিচারব্যবস্থা,সংবিধান, সংবাদমাধ্যম ইত্যাদি উঠে গেলেই বা কী আসে যায় আমাদের ? নৈতিকতার সমস্ত তাৎপর্য হারিয়ে গেলে, উবে গেলেও ক্ষতি নেই । ভোটেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হোক। গণহত্যা নিয়ে বড়জোর হতে পারে জনমত সমীক্ষা। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বীভৎস অসহিষ্ণুতা নিয়ে বিপণনমূলক প্রচার শু হতে পারে যে- কোনও দিন । ফ্যাসিবাদের পদচিহ্ ভারতের মাটিতে এখন স্পষ্টতর । সেই দানবীয় পদক্ষেপের চূড়ান্ত মুহূর্তটা ঘনিয়ে উঠল ২০০২ সালের বসন্তে ? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সন্ত্রাসবিরোধী আন্তর্জাতিক জোট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লাগিয়ে দুনিয়া জুড়ে শান্তির অদ্ভুত আবহাওয়া তৈরি করতে চাইছেন। হয়ত তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই শুর দিনগুলোতে ওঁরা আমাদের জনজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে যে ভয়ঙ্কর ধাক্কা দিলেন,কী বলব তার প্রত্যুত্তরে ? কী জানাব?

১৯৯৮ সালে পোখরান বিস্ফোরণেই ইঙ্গিত জুটেছিল স্বদেশ চেতনা এবার রক্ততৃষ্ণার চেহারায় জনজীবনে স্বীকৃতি পাবে। সময়ের চেয়েও দ্রুততায় তা প্রকাশ্য রাজনীতির মূলস্রোতও হয়ে উঠবে। 'শান্তির অস্ত্র' (পড়ুন পরমাণু অস্ত্র) ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে গেছে ধবংসের কিনারায়।হুমকি,পাল্টা হুমকি, বিদ্রূপ, পাল্টা বিদ্রূপের অজগরসদৃশ পাকে জড়িয়ে পড়েছে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। একটি দ্বৈরথ ও অজস্র মৃত্যুর পর দুই রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ রক্তচক্ষু জওয়ান এখন মুখোমুখি সীমান্তরেখায়। পাকিস্তানের বিদ্ধে কেবলই বেড়ে চলা শত্রুতার মনোভাব সীমান্ত পার হয়ে ঢুকে পড়েছে দেশের রাজনীতির উঠোনে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সহনশীলতা ছিল একদিন , তা বিদ্বেষের দু'মুখো তলোয়ারে আজ আক্রান্ত। এমন ভয়ঙ্কর মুহূর্তেই জনগণের কল্পনার সবটুকু দখল করে নেয় ঈশ্বর পরিত্যক্ত নরকের প্রাণীরা। আমরাই তাদের ডেকে আনি সাদরে। প্রতিবার। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা মাথাচাড়া দিলেই মুসলিমরা নির্মমভাবে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন। পাকিস্তানের বিদ্ধে প্রতিটি রণহুঙ্কারে আসলে আমরা নিজেদের ওপরেই আঘাত হানি। আমাদের বিচিত্র ও প্রাচীন সভ্যতাকেও ছাড়ে না সেই আঘাত। আক্রান্ত হয় সেই সব কিছু যার নিরিখে পাকিস্তান আর ভারত পৃথক দুটিদেশ । ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও হিন্দু জাতীয়তাবোধ কেবলই সমার্থক হয়ে উঠছে। এই জাতীয়তাবোধে নিজের প্রতি সম্মানের চেয়ে অপরের প্রতি ঘৃণাই মিশে থাকে বেশি। এই 'অপর' আপাতত শুধু পাকিস্তানই নয় তা 'মুসলিমও'। জাতীয়তাবোধ যেভাবে ফ্যাসিবাদে পরিণত হচ্ছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। ফ্যাসিস্টদের কাছে রাষ্ট্র শব্দটার অর্থ, তাৎপর্য, ব্যঞ্জনা আমরা গ্রহণ করব না ঠিকই, পাশাপাশি এটাও তো মনে রাখতেই হবে যে, জাতীয়তাবাদই (সে সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদি বা ফ্যাসিবাদী যাই হোক না কেন) বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রতিটি সংগঠিত গণহত্যার উৎস। 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটা শুনলে সতর্ক যে থাকতেই হয় আমাদের । আধুনিক কোনও রাষ্ট্রের বাসিন্দা হিসেবে আমরা নিজেদের চিহ্নিত না করে যদি প্রাচীন সভ্যতার শরিক ভাবতে থাকি, তা হলে কেমন হয় ? একটি অঞ্চলের দখলদারির চেয়ে ভূখণ্ডের প্রতি আমাদের আবেগঘন ভালবাসা গড়ে তুললে কেমন হয় ? সভ্যতার কোনও অর্থ সংঘ পরিবার বোঝে না। আমাদের স্মৃতি, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ সব কিছুকেই সংকীর্ণ করে, ছোট করে, কলুষিত করতে চায় ওরা। কী ধরনের ভারত চায় শেষ পর্যন্ত, ওই সংঘ পরিবার ? মুণ্ডহীন, অঙ্গহীন, হৃদয়হীন,রক্তাক্ত অসম্পূর্ণ এক ভয়ঙ্কর অবয়ব- পতাকালাঞ্ছিত কসাইয়ের ছুরির আঘাতে যার হৃদয় ক্ষত - বিক্ষত ! আমরাও কি সেই রকমই কোনও উদ্দেশ্য আর আকাঙ্ক্ষায় বাঁচি ? আমরাই কি হতে দেব, সেই সর্বনাশ ?

ফ্যাসিবাদের যে ভ্রূণ গত কয়েক বছর ধরে বিকশিত হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে প্রবলতর হয়ে উঠল, তা তো লালিত হয়েছে আমাদেরই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিতে। সকলেই ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে গণতন্ত্রের সঙ্গে। সংসদ, সংবাদমাধ্যম, পুলিশ, প্রশাসন, জনগণ, কে নয় ?'ধর্মনিরপেক্ষ' রাও দায়ী এমন উত্তপ্ত পরিবেশ গড়ে ওঠার জন্য। যখন কোন প্রতিষ্ঠান, অপরিমেয় কোনও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে যেতে চায় প্রশ্নচিহ্নহীন আনুগত্যের আবহে, সেই প্রতিষ্ঠানের অধিকার রক্ষায় যদি নেমে পড়েন আপনি, তা হলে ,হ্যাঁ, আপনিও ধরে ফেললেন ফ্যাসিবাদের হাত। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। আসলে, প্রথম পদচিহ্গুলি চিনে ওঠা সবার পক্ষেই কঠিন, বেশ কঠিন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলি অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে গুজরাতের ঘটনাবলীর নিন্দা করে চলেছে। বি জে পি-র অনুগামীরা অনেকেই খাদের কিনারায় পৌঁছে হলেও নরকের গন্ধ পেয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, এই ক্রমাগত নিন্দারই জেরে । কিন্তু তাঁদের লড়াই কতদিন, কত দূর,কত জোর ? এটা তো আসন্ন ক্রিকেট মরশুমের জন্য তৈরি কোনও প্রচারকৌশল নয়। সব হত্যাই তো খবর হওয়ার মতো উপযুক্ত হয়ে ওঠে না সব সময়। রাষ্ট্রক্ষমতার সবটুকু জুড়ে ধীর নিশ্চিত বিষ ছড়িয়ে দেওয়াও তো ফ্যাসিবাদেরই কৌশল। নাগরিক স্বাধীনতার ধীর সঙ্কোচন, দৈনন্দিনের অদৃশ্য অন্যায়কেও ফ্যাসিবাদই নিয়ে আসে আবহ হিসেবে। এর বিদ্ধে লড়াই করা আসলে মানুষের হৃদয়, মন জয় করার লড়াই । স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা আর মাদ্রাসা নিষিদ্ধ করে এ লড়াই হয় না। এই লড়াইয়ের মানে, জনগণের প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে শিকারি ঈগলের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা । তাদের জবাবদিহির দায় আদায় করা। এই লড়াইয়ের তাৎপর্য, মাটিতে কান পেতে শোনা, প্রকৃত ক্ষমতাহীনদের সুদীর্ঘশ্বাসপতনের শব্দ। কৃষকের উদ্বেগ, তাঁতির যন্ত্রণা, মেয়েদের আয়, বিবাহোত্তর ধর্ষণ, মুচলেকা-দেওয়া শ্রমিক, যৌন অগ্রাধিকার, ইউরেনিয়াম মজুত, অবৈধ উত্তোলন - এ সব বাস্তব বিষয় নিয়ে দেশজুড়ে যে অজস্র প্রতিবাদ আন্দোলনে অগণন স্বর, তার সঙ্গে গলা না মেলালে এই লড়াইয়ে অংশই নেওয়া যায় না। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই আর উচ্ছেদের প্রাত্যহিকতায় নিজেকে না মেলালে আপনি কী করে ভাববেন, এই লড়াইয়ে আপনিও একজন সহযোদ্ধা, সহকর্মী ? আসল ঘটনা থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতে সদাব্যস্ত, চঞ্চল, অস্থির , আবেগ উসকানো, নাটুকে টিভি প্রোগ্রাম আর খবরের কাগজের লেখ

াপত্রের বিদ্ধে নিজেকে, নিজের চেতনাকে দাঁড় করালে আপনি কোন্ নিরিখে লড়বেন ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের সঙ্গে ? দেশের বেশিরভাগ মানুষ গুজরাতের ঘটনায় শিহরিত, আতঙ্কিত । অনেকেই কিন্তু ওই শিহরনের আরও কাছে যাওয়ার জন্য নিজেদের মগজধোলাই করে নিয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন - পার্কে , ময়দানে, ছোট খোলা মাঠে, গ্রামের প্রান্তরে মার্চ করছে আর এস এস। তুলছে গেয়া পতাকা। কীভাবে যেন চারদিকে শুধুই গেয়া , গেয়া, খাকি প্যান্ট, তারা কুচকাওয়াজ করছে, করছে করছেই সর্বত্র। কীসের জন্য? কোথায় যেতে চায় তারা? ইতিহাসের প্রতি স্বাভাবিক অসম্মান তাদের এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রেখেছে, আকস্মিক এসে পড়বে ফ্যাসিবাদ আরও আত্মবিলোপের পথে অবধারিত হাঁটতে হবে তাদেরও। নিজেদেরই মুর্খতার , হায়। কিন্তু,দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পরমাণু বোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মতো, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বিকলাঙ্গ হয়েই বাঁচবে। সে কি কোনও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা? তা হলে, কী সেই আকাঙ্ক্ষা? কোন্ আত্মপ্রতিষ্ঠার ? যার উৎসে থাকে ঘৃণা? ক্রোধ ও ঘৃণার এই মাত্রাকে প্রকাশ্য নিন্দায় বা নিষেধাজ্ঞায় কখনও প্রশমিত করা যায় না। দুরে সরানোর কথা তো ভাবতেই পারা যাচ্ছে না। ভ্রাতৃত্ব বা ভালবাসার স্তবগুলি, গাথাগুলি নিশ্চয়ই মহান, কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে তা যে মোটেই যথেষ্ট নয় !

জাতীয় মোহভঙ্গের বোধ থেকেই যে ফ্যাসিবাদী শক্তি আর আন্দোলন তার সর্বগ্রাসী আগুনের যাবতীয় রসদ কুড়িয়ে নেয়, সে কথা তো ইতিহাস থেকেই জেনেছি আমরা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যগুলি একটু একটু করে অপচয় করে উড়িয়ে দিয়ে যে স্বপ্ন ভেঙে ফেলা হল, সেই ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে জুড়েই তো ভারতবর্ষের ফ্যাসিবাদের শরীর আর মন উঠল গড়ে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে গান্ধীজির সেই বিখ্যাত শব্দবন্ধ, 'কাঠের টি', মানে অভুক্ত দশাতেও যা খাওয়া যায় না, সেই তো স্বাধীনতা আমাদের তাৎপর্যে বাস্তবেও। দেশভাগের সময় যে হাজার হাজার মানুষ নিহত হল, তাদের রক্তে কলঙ্কিত যে স্বাধীনতা, সে তো এক ধারণাই কেবল, ভাবা যায়, স্বাধীনতারই ধারণা। অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে ঘৃণা আর পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা যেন রাজনৈতিক নেতাদের আসল মনোরঞ্জনেরই বিষয় হয়ে থেকেছে। কোনও রাজনৈতিক নেতা সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ারও চেষ্টা করেননি। এই তৎপরতার সূত্রপাতে ও নেতৃত্বে সেই নেত্রী, ইন্দিরা গান্ধী।

প্রতিটি রাজনৈতিক দল আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের হাড়মজ্জা পর্যন্ত শুষে নিয়েছে, ভোটের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটার অর্থ নিয়ে যেন খেলা করেছে। যেমন সুড়ঙ্গ বানায়, অথবা ভূগর্ভস্থ কোনও পথ বানাতে যেমন খুঁড়ে চলে পাহাড়, সেরকমই দেওয়া হয়েছে শব্দটাকে। এখন চারপাশেই চাপে চাপে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে আছে ওই একদা কী বিপুল প্রতিশ্রুতিময়, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। সংবিধান, সংসদ আর বিচার বিভাগকে জুড়ে আমাদের যে কাঠামো, তার ভিতটাই দুর্বল হয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুলির ওই শুষে খাওয়ার অবিরাম তৃপ্তি ও প্রাপ্তিতে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড তো ওই তিনটি বিভাগেরই সমবায়ে, সমন্বয়ে,তাদের ভারসাম্যে ও নিয়ন্ত্রণে। এই যখন পরিস্থিতি, তখন রাজনীতিকদের দোষ দেওয়া বা তাঁদের কাছে নৈতিকতা আশা করা অর্থহীন,কোনও মানে নেই তার। তাঁরা যে অক্ষম- সত্যিই। সেই জনগণ তো সত্যিই কৃপার পাত্র, যে কেবল তার নেতাদের জন্য হাহাকার আর বিলাপ করে। যদি সত্যিই নেতারা, রাজনীতিকরা আমাদের দাবিয়েই থাকে, তবে তা আমাদেরই জন্য। আমরাই তাদের সে সুযোগ করে দিয়েছি। এই যুক্তি তো দেখানোই যায় যে, নাগরিক সমাজ ব্যর্থ হয়েছে নেতাদের সুবাদে, নেতাদের ব্যর্থ তাদের সমাজের সুবাদে। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এক বিপজ্জনক অথচ ব্যবস্থাজাত গলদ আছে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে। সে গলদের ফোকর গলেই রাজনীতিকরা ঠকিয়ে যেতে পারেন সাধারণ মানুষকে, দশকের পর দশক। গুজরাতে যা ঘটছে, তা ওই বহমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাটারই কুৎসিততম ফলাফল। গাছের শিকড়গুলি জুড়ে এখন আগুন। এই আগুন আমাদের নেভাতেই হবে। আগুনের চরিত্র ভুলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? এই দুঃসময়ে? কিন্তু রাজনীতিকরা যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের এই আবহ থেকে ফায়দা তুললেন বা তোলার নিরন্তর চেষ্টা করে গেলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দরজায় ফ্যাসিবাদের এই কড়া নাড়ায় সেটাই এক ও একমাত্র কারণ।

গত অর্ধশতাব্দী জুড়ে, দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার আশা- প্রত্যাশাগুলি সযত্নে ছেঁটে ফেলা হয়েছে তাদের অনুভব আর উপলব্ধি থেকে। মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন, প্রতিদিনের নিরাপত্তা, দারিদ্র্যময় দিনযাপনের থেকে রেহাই- কোনও কিছুই জোটেনি তাঁদের। দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি, মানে যে- সব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ওপর টিকে আছে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র, তার কোনওটিরই সাধারণ মানুষের কাজে না লাগার মতো বাস্তবতা ও আবহ তিলে তিলে তৈরি করা হয়েছে। কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতাই নেই প্রতিষ্ঠানগুলির। হায় ! কখনও সেগুলি অক্ষম, কখনও অনীহার ভারে জর্জরিত। সামাজিক ন্যায়ের কোনও কাজেই কোনও ভূমিকা নেই সেগুলির। প্রকৃত সমাজ পরিবর্তনের সমস্ত প্রয়াস, যাবতীয় কৌশল, পদ্ধতি- যেমন ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের সমবন্টন, যে - সব বিভেদ ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় তার ঠিকঠাক রূপায়ণ- সব ক'টিকেই চতুর, নিষ্ঠুর, ধারাবাহিকভাবে হয় ছেঁটে ফেলা হয়েছে, নয়ত ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। কারা দিয়েছে? রাজনৈতিক ক্ষমতার বারান্দায় যাদের দাম্ভিক, বাস্তব পদচারণা- তারাই ।এখন তো বাণিজ্যের ভুবনীকরণের নিরন্তর, একতরফা প্রবেশকাল। কোথায় ? এক আশ্চর্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, যেখানে সামাজিক বুননটাই জটিল, ভেদবিন্যাসে ঠাসা। কোথায় তার সংহতি? এখন যেন সে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আরও বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত হওয়ার দিকে চলেছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com